A-PDF OFFICE TO PDF DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

উত্তরন

শারদীয়া
সংখ্যা

২০১১ ইং

Growing Seed

দিন ফেরা

ছেলেটি ইস্কুলে পড়ে, দিন ফিরবে।
ঘরে নুন আনতে পান্তা ফুরোয়,
মহাকালের রথের চাকায় পিষ্ট, শ্রান্ত, শীর্ণ
বৃদ্ধ দাওয়ায় বসে দিন ফেরার প্রহর গুনে।
ঘরের চালে শন দিতেই হবে এবার, মেয়ের বিয়ে,
বৌ-এর ঔষধ, কিন্তু কি করে? ভরসা ছেলেটি
স্কুলে পড়ে, চেলে বড় হয়েছে,
দিন ফিরবে।
আজকাল ছেলে মোবাইল ফোনে কথা বলে।
কোনও বন্ধুর মোবাইল হবে হয়তো।
রাত শেষ হয় নতুন সূর্য উঠে।
স্কুলের শেষ পরিক্ষায় ছেলের নাম নেই।
কিন্তু যে দিন ফিরাতেই হবে। বাবাগো,
আমি যে তোমারই মুখ চেয়ে বসে।
ছেলে আজকাল অচেনা মানুষের বাইকে
বাতাসের আগে দৌড়ায়, বাড়ি ফেরে অনেক রাতে।
মায়ের হাতে অনেক টাকা দেয়।
মা খুশী, বাপের মন আনচান।
দিন কি ফিরলো? না কি.....?
গভির রাত। পুলিশের গাড়ী। রাস্তার
কুকুর গুলো গাড়ীর আওয়াজের সাথে সুর মিলায়
তারস্বরে।
ছেলের হাতে হাতকড়া। মা মুর্চ্ছিতা, বাপ স্তম্ভিত,
বোনের চোখে আশঙ্কার জল।
ছেলের পাপের প্রায়চিত্ত করতে চায় বাপ, পায়ে ধরে,
চোখের জল দিয়ে। ‘ছেলেকে যে ইস্কুলে পড়তে দিয়েছিলাম,
বাবু সেতো ডাকাত হবার কথা নয়। আমার আগামি
দিন যে ওই গড়ে দেবে।‘
দিন যে ফেরাতেই হবে। ওর মায়ের ঔষধ, বোনের বিয়ে,
ঘরে নতুন শন!!

--- অরবিন্দ চক্রবর্ত্তী

অসংলগ্ন আখ্যান

এই, আমরা যারা লিখি এ-ওর কাগজে
আমাদের লেখা কেউ পড়ে, -কিংবা না পড়েই
বলে -ধুর ছাই, এসব লেখার কোনো মানে হয় না!
আসলে অনেক কিছুরই কোন মানে হয়না-
যেমন ওই মাটির, যার বুকে কুড়ে কুড়ে কাদার তলে
সবুজ ধানের ক্ষেত, কুমড়ো মাচান, হলুদ ফুল
এর কোনো মানে হয়না, -
ঝড়-জল-রোদ-ঘাম গায়ে মেখে ক্ষয়ে ক্ষয়ে চাষা জীবন
রোগ-ভোগ অবধারিত মৃত্যুর তো
কোনো মানেই হয়না। ওই পাথর অচলায়তন
যার‘ পরে আঘাতে আঘাতে বেরিয়ে পড়ে
শ্রমিকের পাঁজর আর গড়ে উঠে নগর সভ্যতা
ইমারত বহুতল প্রাসাদ মালিকের তরে তিলে তিলে
নিঃশেষের, অবধারিত ধ্বংসের তো
কোনো মানেই হয়না। আর ঐ নদী স্রোত
নদীর পাড় ভাঙা, চলার পথ, মাঝি-নৌকার
এপার ওপার এসবের কোনো মানে হতে পারে না।
ইস্কুল বাড়ি, বি-খাতা, চক-ডাস্টার
ব্ল্যাক বোর্ড, ডেস্ক-বেঞ্চির ‘পরে কান ধরে দাঁড়ানো
পিরিয়ডের পর পিরিয়ড গিলে খেয়ে
অক্ষর বিন্যাস,-
শব্দ আর সংখ্যার সমীকরন
যোগ-বিয়োগ-গুনফলের সঙ্গে
টাকলা মাকান-ইন্দিরা পয়েন্ট-পামীর মালভূমি
কিংবা ‘চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত‘ আর ‘নির্জোট সম্মেলন‘ এর
সঙ্গে সঙ্গে ছুটির ঘন্টার উল্লাস ধ্বনি জীবনভর
মিলিয়ে যেতে যেতে ও কোনো মনে রাখে না।
ক্রমাগত কর্মহীনতার গ্লানিতে ধুকতে ধুকতে
কী মনে রাখতে পারে?
একটি মহাকাব্য, এপিটাফ-রবি ঠাকুরের ‘শেষ প্রশ্ন‘
কিংবা বিভূতিবাবুর পথের পাঁচালীর
এমন কী আস্ত একটি লিখিত সংবিধান
তার জনগন, আর রক্ষক সংসদ, সংসদেরও
কোনো মানেই হয়না।
কোনো মানেই হয়না দেশ,
পরিবার,ভাগ-বাঁটোয়ারা করে যাযাবরের জীবন

আর ফেলে আসা পিতৃ পুরুষের ভিটায়
গজিয়ে উঠা ঝোপঝাড়ে রাত বিরেতে তক্ষকের ডাক
বহুরূপী গিরগিটির রঙ বদলানো খেলা
ঘুঘু চরা আর কখনোই ঘুরে দাঁড়াতে
না পারার বেদনা।

এই সংসার, ঘর-গেরস্তি, সন্তান সন্ততি
বাজার হাট, রুজি রোজগার, খাওয়া-দাওয়া
উৎসব, সত্য-নিষ্ঠা অনুষ্ঠানঅনশন
দুর্নীতির বিরুদ্ধে নীতির অনশন
হাজারে হাজারে মানুষের ধর্ণা
অন্যায়-আবিচার-অত্যাচারের যুগ যুগান্তের
যন্ত্রনার অবসান কোনো নিরন্তর চলার
কোথায় শুরু কোথায় শেষ-
আসলে কোনো কিছুরই বিশেষ কিছু
মানে হয় না, অথচ আমরা লিখে যাই অবিচর
মাথা মুন্ডু.....

--- শ্রদ্ধেয় বিধান চন্দ্র দে

ঠাকুমাগো এই এনেছি 'অ আ ক খ' বইখানা।
আমি পড়ব তুমি পড়বে, পড়তে পড়তে হবে জানা।।
আমি পড়ব! মেয়েদের, বই ছোয়া বারন, জানিস্নে?
শাস্ত্রে সবই লেখা আছে, তোরাই ওসব মানিস্নে।।
ও সব ঠাম্মা মিথ্যে কথা, মেয়েরা কি মানুষ নয়?
সব মেয়েরাই ইস্কুলে যায়, কিছু কি তাতে ক্ষতি হয়?
শিখবো, পড়বো, জ্ঞান বাড়াবো, দেশের হবে উন্নতি।
সবার সাথে মিশবো মোরা, বাড়বে তাতে সম্প্রীতি।।
ঠিক বলেছিস, আনতো তবে, 'অ আ ক খ' বইখানা।
কোন কিছুই জানিনে, তবু, বর্ণমালাই হোক জানা।।
ডেকে আনিস বুড়োবুড়ীদের, সবাই পড়ব, শিখবো, আয়
কাছেতে আয়, এই নে দিদি, কলমটা উপহার।।

--- শ্রদ্ধেয়া বরূনা ভট্টাচার্য্য (চক্রবর্ত্তী)

প্রতিবেশী

খুব কাছে আছি। অথচ জানালা খুলেই অচেনা ঘর
ট্রাণজিস্টারে অনামী গায়ক।
আটপেয়ে ভাষার ঝড়।
একসাথে ঘেষাঘেষি দালান বাড়ি, রাত জাগা আলো
ইট কাঠ পাথর।
ভোর বেলাকার উরন্ত বাতাসে পেয়ালার টুংটাং
পায়রার আনাগোনা, চড়ুইয়ের কিচির মিচির।
নিত্যদিনের রুটিন ভেঙ্গে ভাবি দেখবো এবার
কেমন আছেন আমার প্রতিবেশী
কি করেন? কি ভাবে জীবন কাটান?
সংকল্প নিয়ে যাই দরজায়
নি:শব্দে গুনে যাই জীবনের প্রহর,
প্রতিক্ষার অন্তে খুলে যায় দ্বার
দমকা হাওয়ায় ভেসে আসে-
'এক্সকিউজ মী, আমরা ঘুমিয়ে ছিলাম'।

--- শ্রদ্ধেয় বিধান চন্দ্র দে

দুর্গাপূজা

আনন্দে ভরা দূর্গাপূজা,
আসলে পরেই দারুন মজা।
নতুন কাপড় নতুন জামায়,
আনন্দেতে মন যে মাতায়।
মায়ের সাথে আসেন যে ভাই,
লক্ষী, কার্তিক মশাই।
বিদ্যা দিতে বিদ্যা দেবী,
আসেন যে ভাই তারই সাথী।
আনন্দে ভরা তিনটি দিনেই,
তেলে ভাজা মন্ডা মিঠাই।
অবশেষে দতমীতে,
আসে যে দিন বিদায় দিতে।
অশ্রু জলে বুক ভাসিয়ে
আবার আসার দিন গুনিয়ে
বলি মাকে আবার এসো
মনের পাপগুলি সব ধুয়ে দিয়ো।

--- রজত নাথ

বিজ্ঞান

বিজ্ঞান কোন সাজান নয়,
বিজ্ঞান হল বাস্তব পরিচয়।
বিজ্ঞান নয় যে কোন ভ্রান্ত ধারনা,
বাস্তব বিনা বিজ্ঞান হয় না জানা।
বিজ্ঞান স্থলে যে যুক্তির দোয়ার,
এনে দেয় সুখের জোঁয়ার।
বিজ্ঞান ভেঙ্গে দেয় কুসংস্কারের হাঁড়ি,
বিজ্ঞানের দানে দেই মহাকাশ পাড়ি।
সুখ-দু:খের একাই মূল বিজ্ঞান,
ধ্বংস করে সেই যে হারায় নিজ জ্ঞান।
কিন্তু আজকের বিজ্ঞান আগামীর নয়,
তবুও সবসময় সর্বত্র বিজ্ঞানের জয়।

--- দেবজ্যোতি আচার্য্য

বিজ্ঞান না ভগবান

বিজ্ঞান না ভগবান
কোনটা মানব?
বিজ্ঞানী না সন্ন্যাসী
কার কথা শুনব?
ভগবানের অমৃত বাণী
আর বিজ্ঞানীর আবিস্কার!
কোনটা ছেড়ে কোনটাকে যে দিই
সর্বদামী পুরস্কার।
বিজ্ঞানীর বিরল দৃশ্য সব আর
সন্নাসীর মহৎ শিষ্য
কেমন করে কে যে পায়
সর্ব্বোচ্চ শীর্ষ।
বৃক্ষ পত্র ছাওনী না
মস্ত ল্যবরোটরি
কার আগে কে যে যায়,
হতে চায় সর্ব্বোপরী।
বিজ্ঞান না ভগবান
নারি আমি বলতে কারন
নই যে তত বুদ্ধিমান,
প্রশ্ন তবে এটাই যে
কে সর্ব্বশক্তিমান?

--- রত্নজ্যোতি চক্রবর্ত্তী

সংগ্রাম

জীবনটা একটা নতুন সংগ্রাম
আমরা সংগ্রামের কৃপাপ্রার্থি।
সংগ্রাম হল নতুন জীবনে
চলার পথের চিরন্তন মাপকাঠি।
সংগ্রাম এনে দেয়-
যুদ্ধে চলার অমোঘ মেলবন্ধন।
সংগ্রামে থাকে যুদ্ধে জয়ের
নতুন স্পন্দন।
সংগ্রাম শুধু যুদ্ধ নয়,
শান্তিরও এনে দেয়-
নব জাগরন।

--- দীপালোক ভট্টাচার্য্য

অপেক্ষা

পূর্নিমার রাতের মতো আবছা আলোয়
সাজানো পৃথিবীর বুকে হাসছে চাঁদ।
রঙিন মানুষেরা এখানে আজ আরও রঙিন
আজ যে তাদের আনন্দের দিন!!!
দিন শেষে সূর্য ভোর রাতে আসে নেমে
আমিই শুধু ভিষন একা তোমার অপেক্ষাতে
সত্যি তুমি আসবে কবে?
আনন্দ আজ সবার মনে,
সমস্ত পৃথিবী আজ উৎসব মুখর।
শুধু আমি আছি একা
আছি শুধু তোমার অপেক্ষাতে
তুমি বলেছিলে আসবে বলে,
কথা দিয়েছিলে ভালোবাসবে বলে
বসে আছি তাই তোমার পথ চেয়ে
তুমি আসবে তো?
ভালো বাসবে তো???

--- দেবজানি নাথ

কোথায় গেল শৈশব

আঁখি খুলে স্বপ্ন দেখে, রঙিন আশায় স্বপ্ন ভরা,
অবহেলা, ক্ষুধার জ্বালায় মরে এরা।
তবু দুর্গম গতিতে এগিয়ে চলেছে আজ,
ক্ষুদার জ্বালায় ক্ষুধাতুর শিশু করছে কাজ।
বাসন মাজা, টেবিল মোছা, জল তোলারই ফাঁদে
শৈশব আজ তাদের শুধুই নীরবে কাঁদে!
বিনা চিকিৎসায় বাপ মরতেই সংসারের ভার পরে বুকে,
এক টুকরো স্বপ্ন তার তখনই যায় চুকে।
তবুও তাদের জন্য ভাবেনা কেউ,
তাই তাদের মনে প্রশ্ন থাকে-
কবে আসবে তাদের জীবনে সুখের ঢেউ!

--- দেবজ্যোতি আচার্য্য

মামার বাড়ি

মাটির রাস্তায় রিক্সা গাড়ি
ধীরে ধীরে চলছে।
পুকুর পাড়ে মদন ছোঁড়া
গরুর গাটা জ্বলছে।
গাছের ধারে আরাম করে
রাখাল বালক বসছে।
মদন ছেলের দুষ্টুমিটা
একই তালে চলছে।
টিলার উপর আম কাঁঠালের লম্বা লম্বা সারি
এবার ছুটি কাটাতে গেলাম আমার মামার বাড়ি।

--- দেবজ্যোতি আচার্য্য

আজকের ভারতবর্ষ

আমরা ভারতবাসী, ভারত আমার দেশ
আমরা বেকার, আমরা যুবক
তবুও ভারত আমাদের দেশ।
আমরা অক্ষত, আমরা পদ ধূলিত
তবুও লক্ষে স্থির,
আমরা রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে
বাঁধা গোলকের শিকার,
তবুও ভারত আমাদের দেশ।
আমরা জানি ঐক্যবদ্ধ ভাবে চলার মূল মন্ত্র
তবুও আমরা সমাজের বেড়াজালে আবদ্ধ।
সমগ্র প্রতিকূলতা জরিয়ে ধরেছে চারিদিকে
তবুও আমরা গর্বিত যে আমরা ভারতবাসী।
অমাবস্যার কালো অন্ধকার
একদিন মুছে যাবে তাসের ঘরের মতো,
কিন্তু সমাজের বুকে রয়ে যাবে
ক্ষুদিরাম, সুভাষ, ভগৎ সিং, লক্ষীবাই এর মতো
যুব সমাজের নাম।।

--- দেবজিৎ চৌধুরী ও সুজিত নাথ

ভূতের 'সনেট'

ভূতের রাজা এল বলে সবাই দেয় কান্না জুড়ে,
বুকের ভিতর প্রান পাখিটা যায় যেন উড়ে।
ভূত বলে তোরা সবাই আস এক এক করে,
ভূতের হাত থেকে সবাই বাঁচতে দৌরায় মরে।
ওঝা এসে বসেন যবে, সবাই উনার কথা শুনে,
বুদ্ধিহীনের দল সব আসল উল্টো কাপড় পড়ে।
এসব দেখেও ভূত যখন চায়না যেতে সরে,
তারপর ডাক পড়ল মহাযোগীর দেশে।
এসে বলেন আমায় তোরা ডাকলি অবশেষে,
তখন ওঝাই বলে সাধুবাবা বাঁচান ফকির দরবেশে।
সাধুবাবা পূজোয় বসে মন্ত্র সব পড়ে,
বলেন তিনি আইন করে ভূতকে হবে রাখতে।
প্রশাস্বনে খবর গেল যখন সর্বশেষ,
কু-সংস্কারে বোধ হয় গেল মোদের গোটা দেশ।

--- রত্নজ্যোতি চক্রবর্ত্তী

আদর্শ শিক্ষক

হে শিক্ষক, তুমিই রক্ষক
তুমিই প্রানের উৎস।।
হে শিক্ষক, তুমিই বর্তমানের কারিগর
সমাজের মেরুদন্ড।।
হে শিক্ষক, তোমার প্রানে ছোয়ায়
আলোকিত করো দিগ্‌বিদিক।।
হে শিক্ষক, তোমার জ্ঞানের আলোয়
মুছে যাক সমগ্র দূর্নীতি।।
হে শিক্ষক, তোমার জ্ঞানের পথে
চালিত হয়ে জন্ম নিক এক যুবসমাজ।।
হে শিক্ষক, তুমিই অগ্রদুত তমিই পথ প্রদর্শক
তাই আজ তোমার প্রয়োজন।।
হে শিক্ষক, তুমিই যুবসমাজের প্রানে দিতে পারো
নব আশা, নব উন্মাদনা, নব চেতনা।।
তাইতো তোমার এই সমাজে
জয় হোক্ সর্বত্র।।

--- দেবজিৎ চৌধুরী

উদীয়মান জীবন

উদ্যম গতিতে ছুটছে জীবন-
শপথে থাকতে চায় মন আজীবন-আমরন।
সঙ্কিল চিত্তে আজ অবারিত দোর,
পঙ্কিল পথ আর বাধা নয় মোর।
নয়ন মাঝে আজ উদিছে স্বপ্ন ভুবন,
হৃদয় দুয়ারে পাচ্ছে ইহা সুশোভন।
সত্য সংস্কারে যখন পাগল এই মন-
কর্তব্য-দায়িত্বে 'স্বপ্ন রাজ' হন যে কৃপণ।
থামিয়ে জীবনের দুরন্ত সব ছুট,
ভাবনাকে করে তোলে কুটিল থেকে কূট।
মন পাখির ডানা ছেটে করে তাকে বন্দি,
চন্চল মনকে রুখতে যেন বড় এক ফন্দি।
অঘোষিত চাপের মুখে ভুলে সব ভুল-ঠিক্-
হই যেন শিশু গল্লরাজ্যের পথভোলা পথিক।
বুঝে সে কথা আজ আমার শিহরিত প্রান;
লক্ষ্যে পৌছতে নামতে রণে এই আমার আজ আহবান।
লক্ষ্যের এপারেতে এই শুরু হল যুদ্ধ,
ভাগ্যের সমরেতে হয়ে ওঠী ক্ষুব্ধ।
মানবোনা বাধা আর শুনবোনা ভুলবাণী
জটিল-জীবনেতে নিশ্চয়ই জয়ী হব আমি।
এই আশা রাখি আমি করলাম শেষ
পঠনকে ভাবনায় আনা হেতু ধন্যবাদ অশেষ।

--- রত্নজ্যোতি চক্রবর্ত্তি

জীবন

জীবন এক নরম ছোঁয়া-
সৃষ্টির আদি লগ্নের সাথী।
জীবন নিয়ে ঘেরা থাকে-
সুখ দু:খের কাহিনি।
জীবন-ই জানায়-
নব দিগন্তের এগিয়ে চলার বাণী।
জীবন-ই এনে দেয় স্বপ্নকে জাগিয়ে তোলার-
বাস্তব চাবি-কাঠি।

--- দীপালোক ভট্টাচার্য্য

চাঁদ

চাঁদ তুমি একবার এস আমার ঘরে
কথা বলব তোমার সাথে আদর করে।
জানব কথা, সুনব কথা, বলব কথা তোমার সাথে
মিষ্টি করে কাটাব আমার রাত্রিটা একসাথে।
আসতে যদি পাও লজ্জা তুমি
মেঘের চাদরে উরে এস তুমি।
ভয় করে যদি আসতে তোমার
একবারটি বল আমায়।
চাঁদ তুমি একবার এস আমার ঘরে
কথা বলব তোমার সাথে আদর করে।

--- দেবজ্যোতি আচার্য্য

বিদায়

সেই না ভোলা মুহুর্ত গুলো গেঁথে আছে মনে
আর নোনা জল আছড়ে পড়ছে সাগরপাড়ে
আজ, শুধু একটি কথাই ভেবে-----
কেন তুমি গেলে চলে, কেন চলে গেলে দুরে?
হয়ত তোমারি জন্য হয়েছি যে প্রেম বন্য
বন্যতা কতটুকু ছিল তা বলার বা বোঝাতে
পারিনি বলে আক্ষেপ নেই কোনো
চলে যেতে চাইছো??
যাও তবে তোমার কাঙ্খিত স্থানে।
হওতো এই শেষ দেখা, এই শেষ কথা
আর.....
ভালো থেকো খুসি মনে।

--- দেবজানি নাথ

মানবিকতা

আমরা মানুষ, মানবিকতা আমাদের ধর্ম
মানুষের সেবাই আমাদের কর্ম।
কিন্তু মানবতা বোধ আজ হারিয়ে গেছে
অমাবস্যার ঘন কালো ছায়ায়।
মানুষ আজ ভুলে গেছে-
তাঁর পূর্বপুরুষের নীতিকে
ভুলে গেছে জীবনের মূল মন্ত্রকে।
তাই আজ সেও নিজেকে নিয়ে ভাবতে ব্যাস্ত
আজ তাদের কাছে বড় হয়ে উঠেছে ধন-দৌলত
মা-বাবা যেন আজ তুচ্ছ,
যে মা-বাবা তাদের আলো দেখালো
নিজে না খেয়ে তাদের খাওয়ালো
আজ তারা এইন জীবন্ত দেবতাদের ভুলে গেছে
তাই আজ প্রয়োজন অফুরন্ত প্রানশক্তি-
যা আবার সেই মানবতাকে পুন:জাগরিত করবে।

--- দেবজিৎ চৌধুরী ও স্বপন ধর

মা-বাবা

আমরা মূর্খ, আমরা অজ্ঞ,
আমরা খুজি দেবতারে মন্দিরে মসজিদে,
কিন্তু যে দেবতা আমাদের জন্মদাতা
তাদের আমরা দেখেও দেখিনা
দেখিনা তাদের অস্তিত্বকে;
আমরা খুজে বেড়াই পাথরের মাঝে দেবতাকে।
কিন্তু, যে মা-বাবা দেবতার থেকেও বড়
তাদের তুচ্ছ করে রেখেছি ঘরের কোণে
পাথরের দেবতার চরনামৃত গ্রহন করি স্ব-হস্তে
কিন্তু। জীবন্ত দেবতার চোখের জল-
আমাদের কাছে আজ মূল্যহীন।।

--- স্বপন ধর ও দেবজিৎ চৌধুরী

আহ্বান

হে বীর যুবক
ভবিষ্যতের অগ্রদূত
উঠাও তোমার খর্গ,
দেশমাতৃকার শৃঙ্খলমোচনে
যে বলিদান দিয়েছিল
ক্ষুদিরাম, ভগৎ সিং, বিনয়-বাদল-দীনেশ
তুমিও তাদের মতো
আত্মবলিদানে ব্রতী হও।
তোমার ধারনা খর্গের আঘাতে,
ভেঙ্গে চূড়মার হোক সমাজের দুর্নীতি।
হালভাঙ্গা নৌকার দক্ষ মাঝির মতো,
সমাজকে পৌছে দাও সঠিক ঠিকানায়।

--- স্বপন ধর

জাগরণ

হে ধরিত্রী মা তুমি জাগো-
জাগ তুমি উচ্ছাসে।
তুমি জাগলে উদ্যম পাবে-
তোমার তরুণ দল।
তাই তুমি জাগো
তুমি জেগে উঠো নিজ প্রয়াসে-
উৎসাহিত, উদ্দীপিত করো
তরুণদের মন।
জেগে তুলো তরুণদের
আত্ম-বিশ্বাস;
দূর করো তাদের মনের সংশয়।
এগিয়ে নিয়ে যাও নব দিগন্তের পথে-
উদ্ভাসিত সূর্যের দিকে।
তাই তুমি জাগো-
নিজ উচ্ছাসে, নিজ প্রয়াসে, নব রূপে।

--- দীপালোক ভট্টাচার্য্য

উৎসব

উৎসব আন্দের বৈচিত্র্য-
উৎসবে মেতে উঠে
পৃথিবীর মানুষ।
উৎসবে থাকে জীবনের খুশি,
উৎসব হল মনের মাদুল-
উৎসবে ঘিরে থাকে, আন্দের উল্লাস।
উৎসব হলো সুখ-দু:খের মাপকাঠি।
তাই-তো সকলে বলি-
উৎসবই জীবনের সুরাসুর।

--- দীপালোক ভট্টাচার্য্য

কোথায় আছি আমরা?

''ভারতবর্ষ একটি বিশল দেশ'', এই কথাটি সকল ভারতবাসী গর্বের সঙ্গে বলিয়া থাকেন, হ্যাঁ ইহা বলা স্বাভাবিক। কিন্তু স্বাধীনতার চৌষট্টি বৎসরের মাথায় আসিয়া আমাদের চিন্তা করিতে হইতেছে যে আমরা দেশটার বিশলতার কিলাভ উঠাইতেছি। ইহা ব্যাক্ষা করিতে হইলে প্রথমেই বলিতে হয়-

আমরা ভারতীয়রা আজ জনসংখ্যায় ১২৫ কোটি সংখ্যাটিকেও ছাড়াইয়া গিয়াছি। হ্যাঁ আমরা ১২৫ কোটির অর্ধেক সংখ্যাও সরকারী কাগজ পত্রে সামান্য স্বাক্ষর করিতে কলম ব্যবহারের প্রয়োজন মনে করিনা। বিগত তিন শতকের ইতিহাসের পাতায় দৃষ্টি দিলে দেখা যায় কিছু সাদা চামড়ার লোকেরা আসিয়া আমাদের উপর ঐচ্ছিক শাসন চালাইয়া গিয়াছেন। এই ইতিহাসের সারমর্ম টানিয়া আনাকে হিন্দী-ভাষীরা বলিয়া থাকেন- ''বৃটিশ চলে গেয়ে অওর অওলাত ছোড় গেয়ে''। এই উক্তিটির তাৎপর্য টানিয়া আনিতে হইলে আমাদের ২০১০ খৃষ্টাব্দটিকে টানিয়া আনিতে হয়। রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে চিন্তা করিলে এই সালটি ভারতের জন্য খুবই গুরুত্ত্বপূর্ণ। কারন এই সালে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের দেশগুলির প্রতিনিধিরা ভারত ঘুরিয়া গেছেন। একটা ব্যাপার লক্ষনীয়- মার্কিন রাষ্ট্রপতি ও বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী আসিলেন ইংরেজি বলিলেন, ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি আসিলেন ফ্র্যাঞ্চ বলিলেন, রুশ রাষ্ট্রপতি রুশি ভাষা বলিলেন প্রতিবেশি চীনা প্রধানমন্ত্রী আসিয়া চাইনিজ বলিয়া গেলেন, কিন্তু এই ঘটনা গুলিকে একবার রাখিয়া যদি ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর একটি মার্কিন সফরকে পর্যালোচনা করা যায় তাহলে আমরা দেখিতে পাই মার্কিন রাষ্ট্রপতি ওবামা দু-এক শব্দ হিন্দী বলিতে চেষ্টা করিলেও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী তাহার প্রয়োজন মনে করেন নাই। হে পাঠক বর্গ আমাদের অত্যন্ত দু:খের সঙ্গে বলিতে হয় আমরা অনেকেই ভারতবাসী হওয়া সত্ত্বেও ভারতের রাষ্টীয় ভাষা হিন্দী পড়িতে লিখতে কিংবা কথাও কখনো বলতে পারিনা। আজকাল অধিকাংশ নাগরিকরাই সংস্কার, সংস্কৃতি, সাহিত্য, কলা, ভাষা, পোষাক, বিজ্ঞান সবকিছুতে পাশ্চাত্যের দিকে ঝুকিয়া যাইতেছেন। তাহারা রামানুজন কে ভুলিয়া নিউটনকে গুরুত্ত্ব দিতে নিজেদের অধিক গর্বিত বোধ করেন। তবে হ্যাঁ বিজ্ঞান বিষয়ের ছাত্র হইয়া আমরা উভয়কেই শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে চাই। তাছাড়া ভারতের উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবার সমূহে চোখ ফেলিলে দেখা যায় বাবা 'ড্যাড' হইয়া গিয়াছেন, মা 'মম্' হইয়া গিয়াছেন, শাড়ী ছাড়িয়া প্যান্ট ধরিয়াছেন, হস্ত ছাড়িয়া কাটা চামচ ধরিয়াছেন, সভ্যতার উচু সোপানে উঠিতেছেন। আরো এরুপ উদাহরণ খুজে পাওয়া আজ এক সাধারণ বাস্তব।

আমাদের এই প্রবন্ধ লেখার উদ্দেশ্য কেহকে জ্ঞান দেওয়া কিংবা উপদেশ দেওয়া নহে। আমাদের উদ্দেশ্য হইতেছে যে সভ্যতার লোকেরা নিজ দেশের ভাষা ও কলাকে সম্মান করিতে জানে না, সেই সভ্যতার লোকেরা তো অন্য দেশের লোকের কাছে দামি হতে পারেনা। তাই বলিয়া অনুকরণ দেশের ভাষা সংস্কৃতি ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেনা, এটা বলিতেছিনা। কিন্তু অন্ধ অনুকরনে নিজের সংস্কৃতি ও কলা বিপন্ন না হইয়া যায় সেই দিকে সদা সতর্ক তাকা উচিৎ। আমাদের উদ্দেশ্য পাশ্চাত্য সভ্যতার ওৎর্যনা নহে, বরং নিজেশ্ব ভাবধারাকে হারাইতে না দেওয়া। আমাদের আরও উচিৎ দেশীয় চালচলনের রীতিকে ব্যাক্তিগত ভাবে যথার্থ পর্যবেক্ষন করিয়া ইহার মহৎ দিকগুলিকে নিজ নিজ জীবন শৈলিতে স্থান প্রদান করা। আমরা পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণ

ত্যাগ করিতে বলিতেছিনা। বরং অন্ধ অনুকরনের ভাবনাকে সরাইয়ে দিতে চাইতেছি। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন-

‘‘পশ্চিমে আজি খুলিয়াছে দ্বার,
সেথা হতে সবে আনে উপহার
দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে
যাবে না ফিরে-
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।

ভারতের ভাস্কর এই স্বপ্ন বাস্তবায়নে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটি নিবেদন করিলাম যদি এটি পাঠকদের হৃদয় দুইয়া যায় তবে আমাদের চিন্তার ধামাতুক দিক বজায় থাকিবে------

এই মর্মে মনে পড়িতেছে উনার সেই গানের কলি----------

‘‘ ওরে মাঝি, ওরে আমার
মানব জন্ম তরীর মাঝি
শুনতে কি পায়, দূরের থেকে
পারের বাঁশী উঠেছে বাজি
তরী কী তোর দিনের শেষে
ঠেকবে এবার ঘাটের শেষে
সেথা সন্ধা অন্ধকারে,
দেয় কী দেখা প্রদিপ রাজী।
সেথা আমার লাগছে মনে
মন্দমধুর, এই পাবনে
সিন্ধু পারের হাসিটি কার
অধার চেয়ে আছে আজি
আমার বালার কুসুম গুলি
কিছু এনেছিলাম তুলি
সেগুলি তার নবীন আছে
এই বেলা নে সাজিয়ে মাঝি‘‘

--- অশ্বিনীকুমারদ্বয়

মাতৃআরাধনার ইতিবৃত্ত

প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে ভারতে শক্তিপূজা প্রচলিত।পাঁচ সহস্রাধিক বৎসর পূর্বে পাঞ্জাবের হরপ্পা এবং মহেঞ্জোদারো নগরে দেবী পূজা হইত। উক্ত প্রাচীন নগর দ্বয়ের যে ধ্বংসাবশেষ সিন্ধুনদের তীরে ভূ-গর্ভ হতে আবিস্কৃত হয়েছে , তাহাতে অসংখ্য মৃন্ময়ী দেবী মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। দেবী ছিলেন উক্ত দুই নগরের অধিবাসীগনের প্রধান দেবতা।

বৈদিক যুগেও শক্তিপূজা প্রচলিত ছিল।ঋগ্বেদের দেবীসুক্ত ও রাত্রিসুক্ত এবং সাম বেদের রাত্রিসুক্ত হইতে স্পষ্টই প্রমানিত হয় যে বৈদিক যুগে শক্তিবাদ বর্ধিত হইয়াছিল।ঋকবেদে দেবীর বহূপ্রকার মূর্ত্তির উল্লেখ আছে। এর মধ্যে অন্যতম বিশ্বদূর্গা , সিন্ধু দূর্গা, ও অগ্নি দূর্গা। 'ব্রহ্ম ও তৎশক্তি অভেদ'- এই শাক্ত সিদ্ধান্তটি সামবেদীয় "কেনোপণিষদের" উপাখ্যান হইতে জানা যায় :- দেবাসুর সংগ্রামে ব্রহ্মশক্তির দ্বারাই দেবতাদের বিজয় হইল।স্বশক্তিতে জয়লাভ হইছে মনেকরিয়া দেবগন গৌরবান্বিত হইলেন। তাহাদের মিথ্যা অভিমান অপনোদন করিবার জন্য স্বশক্তি প্রভাবে ব্রহ্ম বিস্ময়কর মূর্তিতে দেবগনের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। দেবগন আবির্ভূত পূজ্যরূপকে জানিতে না পারিয়া অগ্নিকে তৎসমীপে প্রেরন করেন। পূজ্যরূপী ব্রহ্ম অগ্নির কাছে জানতে চাইলেন উনার নাম এবং শক্তি কি। অগ্নি বলিলেন -'আমি অগ্নি নামে প্রসিদ্ধ,এই পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তৎসমূদয় আমি দগ্ধ করিতে পারি।' ব্রহ্ম অগ্নির সম্মুখে একটি তৃণ স্থাপন করিয়া দগ্ধ করিতে বলিলেন।অগ্নি সর্বশক্তি প্রয়োগেও তৃণখন্ড দগ্ধ করিতে অসমর্থ হইয়া অবনত মস্তকে দেবতাগনের সমীপে ফিরিয়া আসিলেন।অনন্তর ইন্দ্র ছদ্মবেশী ব্রহ্মের সমীপে উপস্থিত হইলে ব্রহ্ম অন্তর্হিত হইলেন এবং তৎপরিবর্তে আকাশে সুশোভনা উমা হৈমবতী দেবীকে ইন্দ্র দর্শন করিলেন।দেবী তাহাকে জানাইলেন যে- ব্রহ্মশক্তির দ্বারাই দেবতাগন শক্তিশালী এবং অসুর সংগ্রামে বিজয়ী।

'সাংখ্যায়ন গৃহ্যসূত্রেও' দেবীর উল্লেখ আছে 'ভদ্রকালী' নামে। শুক্ল যজুর্বেদের বাজসনেয়ী সংহিতায় অম্বিকা দেবী রুদ্রের ভগ্নীরূপে কথিতা। আবার কৃষ্ণ যজুর্বেদের তৈত্তিরীয় আরন্যকের মতে অম্বিকা রুদ্রের স্ত্রী। উক্ত আরন্যকের নারায়ন উপনিষদে আছে :-

" তামগ্নি বর্নাং তপসা জ্বলয়ন্তীং বৈরোচনীং কর্মফলেষু জুষ্টাম
দূর্গাং দেবীর শরণমহং প্রপদ্যে সুতরসি তরসে নমঃ।।"

অর্থাৎ আমি সেই বৈরোচনী অর্থাৎ পরমাত্মা কতৃক দৃষ্ট অগ্নিবর্না ,স্বীয় তাপে শত্রুদহনকারিনী,কর্মফলদাত্রী দূর্গা দেবীর শরনাগত হই।
উক্তরূপে তৈত্তীরীয় আরন্যকের অন্তর্গত যাঞ্জিকা উপনিষদেও দূর্গা দেবীর উল্লেখ আছে।

হিন্দু তন্ত্রের ন্যায় বৌদ্ধ্যতন্ত্রেও দেবী দূর্গার অনেক উল্লেখ আছে।নালন্দা ও বিক্রমশীলা নামক বৌদ্ধ্য বিশ্ববিদ্যালয়দ্বয়ে তন্ত্রশাস্ত্রের অধ্যাপনা হইত। হিন্দুদের নিত্যপাঠ্য শাক্ত ধর্মগ্রন্থ শ্রী শ্রী চন্ডী একসময় বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের প্রিয় হইয়াছিল। জনৈক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর স্বহস্তে লিখিত একখানি চন্ডী নেপালে পাওয়া গিয়াছে। উহা প্রায় এক সহস্র বৎসর পূর্বে লিখিত। বাংলাদেশেই বৌদ্ধতন্ত্র সমৃদ্ধ হয়।

ডক্টর বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য তাঁহার 'Introduction to Buddhist Esotericism'

গ্রন্থে দেখাইয়াছেন যে হিন্দু শাস্ত্র নানা বিষয়ে বৌদ্ধ্য তন্ত্রের নিকট ঋনী। কয়েকখানি প্রসিদ্ধ হিন্দুতন্ত্রে কালী, তারা , ষোড়শী , ভূবনেশ্বরী , ভৈরবী , ছিন্নমস্তা , ধূমাবতী , বগলা , মাতঙ্গী , ও কমলা এই দশ মহাবিদ্যার যে বর্নণা আছে তৎসমূদয় বৌদ্ধ্যতন্ত্র হতে গৃহীত। ইহা বৌদ্ধ্যতন্ত্র সাধনমালা পরিদৃষ্টে বুঝাযায়।

জাপানে এক বৌদ্ধ দেবী পূজিতা হন। তাঁহার নাম সপ্তকোটী বুদ্ধমাতৃকা চনষ্টী দেবী বা কোটিশ্রী। জাপানী ভাষায় চনষ্টী শব্দ এবং সংস্কৃত চন্ডী শব্দ একার্থক। বৌদ্ধ ধর্মের মারীচী দেবীও দশভূজা।তিব্বতী লামাগন মারীচী দেবীকে উষা দেবীরূপে আবাহন করেন। বৌদ্ধশাস্ত্র 'মহাবস্ত'তে আছে বুদ্ধদেব যখন জননীর সঙ্গে কপিলাবস্ততে আসেনতখন শাক্য বংশের শাক্যবর্ধণ মন্দিরে অভয়াদেবীর পাদবন্দনা করেন।কারও কারও মতে অভয়াদেবী ই দূর্গা দেবী । চীনের ক্যান্টন শহরে অবস্থিত বৌদ্ধ মন্দিরে একটি শতভূজা দেবীমূর্তি আছে যা অনেকাংশে দূর্গা দেবীর ই মতো।

জৈন ধর্মেও শক্তিবাদ প্রবেশ করিয়াছিল। রাজপুতানার আবু পাহাড়ে যে বিখ্যাত শ্বেত প্রস্তর নির্মিত সুবৃহৎ জৈন মন্দির বিরাজিত তাহাতে অনেকগুলি দেবীমূর্তি আছে। জৈনদের নিকট সরস্বতী বিদ্যা, জ্ঞান ও বলবিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

কৃত্তিবাসকৃত বাংলা রামায়নে রাবন ও রাম উভয়েই দেবী ভক্ত ছিলেন। বাল্মীকির রামায়নে উহা নেই। দূর্গাপূজার মন্ত্রে আছে ''রাবনস্য বিনাশায় রামাস্যানুগ্রহায় চ অকালে বোধিতা দেবী।

প্রবাদ অনুসারে রামই শরৎকালে দেবীর বোধন করেন রাবন বধের জন্য। রাবন ও মেঘনাদ উভয়েই দেবীর আরাধনা করতেন। রামের আরাধনায় সম্প্রীতা হয়ে রাবন কে পরিত্যাগ করেন। এই মতে বাসন্তী পূজা ই প্রকৃত দেবীপূজা। যাই হোক, সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে ও শক্তিবাদ সমৃদ্ধ হয়েছিল। বিষ্ণুপুরাণ, ভগবতপুরান ইত্যাদিতেও শক্তিবাদের সমৃদ্ধি দেখাযায়। দূর্গাপূজা যে একসময়ে বাংলার গ্রামে গ্রামে হইত তাহার প্রমাণ ধনী হিন্দুর বাড়ীতে এক একটি চন্ডিমন্ডপ ছিল। ১৩৫৭ সালে কলিকাতা মহানগরী ও তৎউপকণ্ঠে পূজার সময় দুই শহস্রাধিক দূর্গাপ্রতিমা নির্মিত হয়।

অন্যান্য ধর্মের তুলনায় হিন্দু ধর্মেই শক্তিবাদ অধিক সমৃদ্ধ। বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রূপের দেবীমূর্তি পাওয়া গেছে। 'বৈকৃতিক রহস্যের' মতে দেবী আসলে সহস্রবূজা হলেও তিনি মূলত অষ্টাদশভূজা রুপে পূজ্য। এখানে সহস্র শব্দ অনন্তবাচী। সুতরাং দেবী অনন্তভূজা অর্থাৎ বিশ্বব্যাপিনী। চন্ডীর ৫ম অধ্যায়ে দেবতাগন মহামায়াকে স্তব করিবার সময় বলিয়াছেন যে চেতনা, বুদ্ধি, নিদ্রা, ক্ষুদা, ছায়া, শক্তি, তৃষ্ণা, শান্তি, জাতি, লজ্জা, শ্রদ্ধা, কান্তি, লক্ষি, বৃত্তি, দয়া, মাতা, তুষ্টি ও ভ্রান্তি রুপে দেবী সর্বভূতে বিরাজিত। শুধু তাই নয় মানবদেহের প্রত্যেক অঙ্গে ও বিশ্বের সকল বস্তুতে দেবী প্রকাশিতা।

মহামায়া বিশ্বব্যপিনী হইলেও নারীমূর্তিতে তাঁহার সমৌবিক প্রকাশ- ইহা চন্ডীর নারায়ণী স্তুতিতে উক্ত।দেবীর অংশে নারীমাত্রেরই জন্ম। অল্প সমবয়স্কা, সমবয়স্কা বা বয়োবৃদ্ব নারী মূর্ত্তি জগদম্বার ই জীবন্ত চিত্র। প্রত্যেক নারীকে দেবী মূর্তি জ্ঞানে পূজা করাই মহামায়ার শ্রেষ্ঠ উপাসনা। এই জন্যই দূর্গাপূজাতে কুমারী পূজার বিধি। এই জন্যই শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস স্বীয় সহধর্মীনী সারদাদেবীকে জগৎ জননী জ্ঞানে ফুল চন্দন মন্ত্রাদি দ্বারা বিধিবৎ পূজা করিয়াছিলেন।

--- শুভ্রদীপ ভট্টাচার্য্য

জীবন দর্শন

দিন আসিতেছে, দিন আসিতেছে;- সমাজ পঙ্কিল বারিতে প্রক্ষালিত হইবে, সমাজ আর সমাজ থাকিবেনা। তাতে থাকিবে শুধু কন্টক যুক্ত বিষ আর বিষ। সমাজ যে প্রক্ষালিত হইবে। পাইবেনা খুঁজে আন্তরিক বেদনা গ্রহীতা।

'মানুষ মাত্রেই ভুল'- একথা অবিনশ্বর। কিন্তু এমন একটা ভুল ঘটিতেছে তাতে শুধু বিষাগ্র রসনা পরিব্যাপ্ত হইতেছে। কিন্তু এই মারাত্মক ভুল যে জীবান্তক তাহা জিক্ষ মানুষেরা বুঝিতে পারে নাই। বাল্যকাল কিংবা শৈশব কাল হইতে 'সে' শিক্ষালয় কিংবা বিদ্যালয় হইতে জ্ঞানার্জন করিতেছে কূটনীতিপরায়ন বুদ্ধি হইতে সর্বদা দূরবর্তিতা বজায় রাখা। কিন্তু 'সে' সেই গুরু কুলের ময়দানে কিংবা কিংবা ক্রীড়া প্লমিও ময়দানে কিংবা পথের দিশা হারাহীয়া সেই পথের মধ্যখানে দন্ডায়মান রহিয়া ক্রোড় ক্রোড় ভুল পথ অবলম্বন করিয়া মন্দ গালাগাল কিংবা জীবন সঙ্গী/সঙ্গীনি অন্বেষণের এক একক দুর্দান্ত প্রতিযোগীতা শুরু করিয়াছে। চলিতেছে সন্ধান নিজস্ব প্রচেষ্ঠায় নতুবা আরিন্দা মাধ্যমে। মিলিয়া গেল সেই স্বল্প কাঙ্খিত অনারাধ্যা মানুষ- জীবনের পর্যায়ে শুরু হল নতুন এক অধ্যায়। কিয়ৎকাল পশ্চাৎ হইলে পরে সেই কাঙ্খিতই হইয়া ওঠে অনাকাঙ্খিত। তখন আবার তত্ত্ব-তালাশ চালাইয়া দিগন্ত পরিব্যাপ্ত করিয়া অন্যত্র হইতে নব কাউকে ধরিয়া আনিবার কোনো প্রয়োজন হয় না। বরং সেখান হইতেই নিজেস্ব মানসিক বুদ্ধি আপরীক্ষিত রাখিয়া নব কেউ চলিয়া আসে 'কৃষ্ণলীলা' য তৈরি করিতে হইবে।

কিন্তু যখন প্রকৃত সময় হইবে তখন তুমি কাউকে খুঁজিয়া পাইবেনা নিজস্ব- কারণ তুমি যে উনার প্রত্যাশিত মানুষ নও। কিন্তু এতে সমাজ 'সুধাগ্রস্থ' হচ্ছেনা; হচ্ছ শুধু কলুষিত। তাই এই

কুশাঙ্কুর হইতে দুরত্ত্বে চলিবার পথটুকু নিজেদের খুঁজিয়া বাহির করিয়া নিতে হইবে, নতুবা জীবন ধ্বংসমুখ অনুসরনকারী- অবিশ্যম্ভাবী। ঠিক এই সময়ে যদি বিবেকানন্দ, বিদ্যাসাগর, রাজা রামমোহন প্রমুখ জীবন ধরন পাল্টাইবার মহা পুরুষেরা বা তাঁদের বাণী কিংবা উপদেশাবলী প্রসারিত হয়, তাহা হইলে সেই 'প্রাচীন' যুগের মতো এক নবযুগ সৃষ্ঠি হইবে। বর্তমান সভ্যতায় তাঁহা দিগের দর্শিত পথ দর্শন নিতান্তই প্রয়োজন এবং তাঁহাদিগের অগ্নিশিখা সম পরিবর্তন কারী বাণী হৃদয়মঞ্চে গ্রথীত হওয়াও ততটাই প্রয়োজন নতুবা পাথির্ব সভ্যতার অবশেষ টুকু চিতানলে ভষ্মীভূত হইয়া যাইবে।

--- রত্নজ্যোতি চক্রবর্তী

জীবন দর্শন

দিন আসিতেছে, দিন আসিতেছে;- সমাজ পঙ্কিল বারিতে প্রক্ষালিত হইবে, সমাজ আর সমাজ থাকিবেনা। তাতে থাকিবে শুধু কন্টক যুক্ত বিষ আর বিষ। সমাজ যে প্রক্ষালিত হইবে। পাইবেনা খুঁজে আন্তরিক বেদনা গ্রহীতা।

'মানুষ মাত্রেই ভুল'- একথা অবিনশ্বর। কিন্তু এমন একটা ভুল ঘটিতেছে তাতে শুধু বিষাগ্র রসনা পরিব্যাপ্ত হইতেছে। কিন্তু এই মারাত্মক ভুল যে জীবান্তক তাহা জিক্ষ মানুষেরা বুঝিতে পারে নাই। বাল্যকাল কিংবা শৈশব কাল হইতে 'সে' শিক্ষালয় কিংবা বিদ্যালয় হইতে জ্ঞানার্জন করিতেছে কূটনীতিপরায়ন বুদ্ধি হইতে সর্বদা দূরবর্তিতা বজায় রাখা। কিন্তু 'সে' সেই গুরু কুলের ময়দানে কিংবা কিংবা ক্রীড়া প্লমিও ময়দানে কিংবা পথের দিশা হারাহীয়া সেই পথের মধ্যখানে দন্ডায়মান রহিয়া ক্রোড় ক্রোড় ভুল পথ অবলম্বন করিয়া মন্দ গালাগাল কিংবা জীবন সঙ্গী/সঙ্গীনি অন্বেষণের এক একক দুর্দান্ত প্রতিযোগীতা শুরু করিয়াছে। চলিতেছে সন্ধান নিজস্ব প্রচেষ্ঠায় নতুবা আরিন্দা মাধ্যমে। মিলিয়া গেল সেই স্বল্প কাঙ্খিত অনারাধ্যা মানুষ- জীবনের পর্যায়ে শুরু হল নতুন এক অধ্যায়। কিয়ৎকাল পশ্চাৎ হইলে পরে সেই কাঙ্খিতই হইয়া ওঠে অনাকাঙ্খিত। তখন আবার তত্ত্ব-তালাশ চালাইয়া দিগন্ত পরিব্যাপ্ত করিয়া অন্যত্র হইতে নব কাউকে ধরিয়া আনিবার কোনো প্রয়োজন হয় না। বরং সেখান হইতেই নিজেস্ব মানসিক বুদ্ধি আপরীক্ষিত রাখিয়া নব কেউ চলিয়া আসে 'কৃষ্ণলীলা' য তৈরি করিতে হইবে।

কিন্তু যখন প্রকৃত সময় হইবে তখন তুমি কাউকে খুঁজিয়া পাইবেনা নিজস্ব- কারণ তুমি যে উনার প্রত্যাশিত মানুষ নও। কিন্তু এতে সমাজ 'সুধাগ্রস্থ' হচ্ছেনা; হচ্ছ শুধু কলুষিত। তাই এই কুশাঙ্কুর হইতে দুরত্ত্বে চলিবার পথটুকু নিজেদের খুঁজিয়া বাহির করিয়া নিতে হইবে, নতুবা জীবন ধ্বংসমুখ অনুসরনকারী- অবিশ্যম্ভাবী। ঠিক এই সময়ে যদি বিবেকানন্দ, বিদ্যাসাগর, রাজা রামমোহন প্রমুখ জীবন ধরন পাল্টাইবার মহা পুরুষেরা বা তাঁদের বাণী কিংবা উপদেশাবলী

প্রসারিত হয়, তাহা হইলে সেই ‘প্রাচীন‘ যুগের মতো এক নবযুগ সৃষ্ঠি হইবে। বর্তমান সভ্যতায় তাঁহা দিগের দর্শিত পথ দর্শন নিতান্তই প্রয়োজন এবং তাঁহাদিগের অগ্নিশিখা সম পরিবর্তন কারী বাণী হৃদয়মঞ্চে গ্রথীত হওয়াও ততটাই প্রয়োজন নতুবা পাথির্ব সভ্যতার অবশেষ টুকু চিতানলে ভষ্মীভূত হইয়া যাইবে।

--- রত্নজ্যোতি চক্রবর্তী

জাপান (১১/০৩/২০১১)

পৃথিবীর তাবৎ বলবান উন্নত দেশ গুলির মধ্যে অন্যতম দেশ জাপান! শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্প, প্রযুক্তির দিক থেকে বলতে গেলে পৃথিবী শ্রেষ্ঠ হল জাপান। কিন্তু সৃষ্ঠি লগ্ন থেকেই জাপান ভৌগলিক দিক থেকে প্রচন্ড সঙ্কটময় অবস্থায় অবস্থিত। জাপান সর্বদা ভূমিকম্পে কম্পিত হয় বলে এর আরেক নাম ‘‘ভূমিকম্পের দেশ‘‘। সম্প্রতি এক প্রবল ভূমিকম্পের ফলে প্রচন্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় উদীয়মান সূর্যের দেশ জাপান। তারই কিছু জানা অজানা ঘটনা পাঠক বৃন্দের কাছে তুলে ধরছি।

দিনটা ছিল শুক্রবার কর্মব্যস্ত জাপানে সবাই নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত, সূর্যের তেজ তখন সবেমাত্র ম্লান হচ্ছে সেই সময় বিকেল ২ টা বেজে ৪৬ মিনিট নাগাদ হঠাৎ প্রবল ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল তথ্য-প্রযুক্তির দেশ জাপান। ভারতীয় সময় অনুযায়ি তখন দুপুর ১১ টা বেজে ১৬ মিনিট। জাপানের আবহাওয়া দপ্তর জানিয়ে দেয় ভূ-কম্পনের উৎস ছিল জাপান উপকুল থেকে ১৩০ কি.মি দুরে সমুদ্র গর্ভে, রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৮.৯, প্রায় ৯। তারা আরও জানিয়ে দেয় যে প্রায় ১৪০ বছরের মধ্যে এত তীব্র ভূ-কম্পন আর হয়নি। জাপানের রেকর্ড অনুযায়ি ১৯২৩ খৃষ্ঠাব্দে যে সর্বোচ্চ ভূ-কম্পন হয়েছিল তার তীব্রতা ছিল ৭.৯।

২০১১ খৃষ্ঠব্দে শুধু ভূ-কম্পন ই নয় তার সাথে দেখাদেয় প্রবল সুনামি বা জলোচ্ছাস। জলোচ্ছাস এর উচ্চতা ছিল প্রায় ৯.৭ মিটার থেকে ১০ মিটার। এত তীব্র জলোচ্ছাসের ফলে জলের নিচে তলিয়ে যায় শত সহস্র বাড়ি-ঘর, জাহাজ, গাড়ি ইত্যাদি। সাথে সাথে সতর্কতা বার্তা সম্প্রসারন করা হয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলবর্তি সমস্ত অঞ্চলে।

এই প্রবল ভূ-কম্পনে উননোমা পরমানু কেন্দ্রে এবং মোন্দাই তৈল শোধনাগারে আগুন ধরে য়ায়। তৎক্ষনাৎ প্রায় ৪০ লক্ষ বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ হয়ে যায়। শুধু বিদ্যুৎ নয়, রেল সংযোগ, সড়ক পথ সমস্ত যোগাযোগ মাধ্যম সম্পুর্ন ভাবে বন্ধ হয়ে যায়। ভূ-কম্পনের ফলে বিধ্যস্ত হয় প্রায় ৩৪০০ টি বিল্ডিং, প্রায় ১৮১ টি নার্সিং হোম সম্পুর্ন ধ্বংস হয়ে যায়। এর জেড়ে কেপে উঠেছিল উপকুল থেকে প্রায় ৪০০ কি.মি দুরে অবস্তিত রাজধানি টোকিও। মোট ১১ টি পারমানবিক কেন্দ্র বন্ধ হয়ে যায় ভূ-কম্পনের ফলে।

প্রশান্ত মহাসাগরের বুক থেকে প্রায় ১০ মিটার উচ্চ ঢেউ সিংহনাদ তুলে এগিয়ে এল জাপানের দিকে! স্থল ভাগের বেশ কয়েক কি.মি অঞ্চল জুরে এই সুউচ্চ জল তার স্বমহিমায় সবকিছু তছনছ করে দেয়। জাপান সরকার সাথে সাথে ৯০০ জনের একটি উদ্ধার কার্যের টিম

তৈরি করে পাঠিয়ে দেয়। এই তীব্র ভূ-কম্পনের ফলে প্রায় ১০ হাজার এরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়।

এর পরদিন অর্থাৎ ১২/৩/২০১১ ভয়াবহ ভূমিকম্প থেকে অব্যাহতি পাওয়া গেলেও ভয়ঙ্কর সুনামি জাপানের উত্তর পূর্বাঞ্চলে আরেক বিপদ ঘটায়, হিরোশিমা-নাগাশাকির ভয়াবহ অভিজ্ঞতা আরও একবার জাপানবাসিকে স্মরন করিয়ে দিল ফুকুশিমার ১নং পরমানু চুল্লিতে ভয়াবহ তেজস্ক্রিয় বিকিরনের আশঙ্কা। অর্থাৎ পরমানু কেন্দ্রে বিস্ফোরন! পরমানু কেন্দ্রের পাচিল উড়ে গিয়ে বায়ু মন্ডলে বেরিয়ে আসে তেজস্ক্রিয় বিয়োজক। প্রায় ৪৫ হাজার মানুষকে এই অন্চল থেকে নিরাপদ অন্চলে নিয়ে আসা হয়।

এর পরদিন ফুকুশিমার ২নং চেম্বারে বিস্ফোরন দেখা দেয়। সরকারের পক্ষ থেকে জাপান বাসীকে সতর্ক থাকতে বলা হয়। সেই সময় থেকেই বাতাসে তেজস্কিয় বিকিরণ শুরু হয়ে গিয়েছিল। তবে এর মাত্রা কম থাকায় ভয়ের কারন ছিলনা।

১৪ই মার্চ জাপানের আরেকটি চুল্লিতে ঘটল প্রবল বিস্ফোরন। এইদিন প্রবল বিস্ফোরনের জেরে মারাত্মক ভাবে কেঁপে উঠল জাপান ভূমি। দ্রুত তেজস্ক্রিয় বিকিরণ ছড়িয়ে পরতে থাকল। স্বাভাবিকের চাইতে ৮০০ গুন বেশি বিকিরণ ছড়াতে আরম্ভ করল। জাপানের প্রধানমন্ত্রী কাউকে ঘরের বাইরে না যেতে অনুরোধ জানালেন। জাপানের পরিস্থিতি হয়ে উঠেছিল চেরানোবিল এর মতো।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ জাপানকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। এবং ক্রমে জাপানের এই ভয়াবহ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আসে। কিন্তু এখনও সমস্ত পৃথিবীতে সতর্কতা জারি আছে যেন কেউ বৃষ্টিতে না ভেজেন কারন বৃষ্টির জলের সাথে থাকতে পারে তেজস্ক্রিয় পরমানু।

--- সহনোব নাথ

যুব সমাজের অগ্রগতি

সবুজ সতেজ যুবসমাজ জাতির সর্বাপেক্ষা বলিষ্ঠ অংশ। নবীন প্রানশক্তির অফুরন্ত উচ্ছাসে ভরপুর তাদের দেহ-মন। হৃদয়ে অসীম দু:সাহস। চোখে তাদের উদ্বিপনার জ্বলন্ত মশাল, বক্ষে অসম্ভবকে 'চ্যালেঞ্জ' করার দুর্জয় প্রতিশ্রুতি। প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরা এই তরুন গরুড়ের দল জাতির অসীম শক্তি ও সম্ভাবনার নির্ভীক প্রতীক ভবিষ্যতের চালিকা শক্তি।

প্রাক-স্বাধীন ভারতে বিভিন্ন বহি: শাসকগোষ্ঠি তাদের ঔপনিবেশিক শাসন নীতির মাধ্যমে তাদের তেজ বিকীর্ণ করেছে। রক্তচক্ষু ইংরেজ শাসন, শোষন অত্যাচার যার ভয়ে জননী ক্রোড়ে শায়িত শিশুচিত্ত পর্যন্ত কেঁপে উঠত।

পরাধীনতার অন্ধকারে নিমগ্ন জাতির হৃদয়কে কে অগ্নিমন্ত্রে উজ্জীবিত করে তুলেছিল? নির্দিধায় বলা যায় যুব সমাজ তথা যুবশক্তি। ভগৎ সিং, ক্ষুদিরাম, বিনয়-বাদল-দীনেশ প্রমুখ যুবক গোষ্ঠী দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনে 'মৃত্যুকে পায়ে ভৃত' করে মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছিল। প্রত্যেক জীব চায় স্বাধীন ভাবে বঁচাতে, স্বাধীন ভাবে মত প্রকাশ করতে, কিন্তু স্বাধীনতার উপর অপরের হস্তক্ষেপ সে কোন দিন মানে নি আর মানবেও না কারন স্বধীনতা জন্মগত অধিকার।

কিন্তু স্বাধীনতার ৬৪ বছর পর সেইসব প্রবল পরাক্রমী বহি: শাসকগোষ্টীর ঔপনিবেশিক শাসন আজ না থাকলেও দেশ আজও দুর্নীতির আচলে ঢাকা। সর্বত্র ফাঁকি, বন্চনা, প্রতারনা এবং অন্ধকারে জগতের আত্মঘাতী পথের গোপন হাতছানি। সমাজের প্রতিটি স্তরে, প্রতি পদক্ষেপে সুদখোর, মুনাফাখোর দালালদের হস্তক্ষেপ- দেশ আজ প্রবল অরাজকতার শিকার। এই দুর্যোগপূর্ণ অবস্তায় দাড়িয়ে যুব সমাজ আজ দিশাহীন। বাইরের প্রবল আঘাত এবং অন্তরের প্রান প্রাচুর্যের দুরন্ত তাড়নায় পথভ্রষ্ট হয়ে সে ক্ষতবিক্ষত। যে যুবসমাজ সত্যবাদী, সে আজ সত্যের সম্মুখিন হতে পারছেনা।

সমাজ তথা দেশ আজ অসাম্যতায় ভুগছে। একই যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও যুবসমাজের একাংশ বিলাসবহুল জীবন যাপন করছে, একাংশ আজ বেকার। কেন তারা বেকার? তাদের অপরাধটা কোথায়? অর্থের জোরে একাংশ আয়াসে জীবন অতিবাহিত করবে, বাকিরা কি নর্দমায় পড়ে থাকবে! যে যুবসমাজ সমাজের ধারক ও বাহক, অর্থ নেই বলে কি তারা মান মর্যাদা হারিয়ে ফেলেছে। দেশ আজ চরম বিশৃঙ্খল, যার ফলে দেশের উন্নতির পথে সৃষ্টি হচ্ছে অন্তরায়। উদাহরন স্বরুপ বলা যায় জাপান ভারতের তুলনায় অনেক ছোট একটি দেশ। কিন্তু উন্নতিতে কোন দেশ এগিয়ে-- জাপান। কেন এরকম হল? উদাহরনটা খুঁজলে বুঝা যায়- মূল কারন যুবসমাজ। জাপানের যুবশক্তি প্রচন্ড দক্ষ, শক্তিশালী, ফলে ক্ষুদ্র দেশটাও প্রবল শক্তিশালী।

সমাজে অশুভকাঙ্খী শক্তি মাথা চারা দিয়ে উঠেছে। সমাজের পিছিয়ে পরা বেকার যুবকদের তারা অর্থের লোভ দেখিয়ে ধ্বংশলীলায় যুবসমাজকে সামিল করছে। সংসারের চাপে, অর্থের লোভে নিজের জীবন পরোয়া না করেই এই যুব সমাজ তৈরি করছে পারমানবিক বোমা, মানব বোমার মতো জীবন হরনকারী অস্ত্র-শস্ত্র। এই ন্যয় নির্ভীকতার প্রতীক আজ অপরাধী। কিন্তু এই যুবসমাজ অপরাধী ছিল না।

ভারত বর্তমানে বিশ্বের উন্নত দেশগুলির মধ্যে একটি। চিকিৎসা, পরিবহন ব্যবস্থা, অস্ত্র-শস্ত্র সর্বক্ষেত্রে ভারত আজ শ্রেষ্ঠ। কিন্তু এই শ্রেষ্ঠ দেশে যুবসমাজের প্রতি এত অন্যায় কেন? কেনই বা তারা অপরাধে মাতবে? কারন একটাই সাম্রাজ্যবাদী, কূটনীতিবিদ শক্তির দুর্নিবার লোভ

লালসা। এইসব যুব সমাজের মর্মতলে বিষ ঢুকিয়ে তার স্বার্থ চরিতার্থ করার আকাঙ্খা - যার ফল স্বরুপ যুবসমাজ ধুকছে মৃত্যুশয্যায়।

যুবসমাজের প্রান প্রাচুর্যের প্রবলতায় তারা জির্ণ জড়তাকে আঘাত করে, পুরাতনকে ভাঙ্গে, নতুনকে গড়ে। তারা ভালো-মন্দ সবকিছুর সম্মুখিন হয়। হাঁস নর্দমার জলে সাঁতার কাটে, কিন্তু সে নর্দমার খাদ্যবস্তু গ্রহন করে। ঠিক সেভাবেই যুবসমাজ যদি ভালোকে সার্বিক ভাবে গ্রহন করে এবং মন্দকে ফেলে দেয়, অসৎকামী শক্তিকে সমূলে উৎখাত করা যায় তাহলে অচিরেই যুবসমাজ শক্তিশালী হয়ে উঠবে। ফলে জাতি শক্তিশালী হয়ে উঠবে, কর্মহীনতা ও দু:খ-দুর্দশার অবসানে জয়লাভ করবে এক বিশাল প্রাণ, প্রানশক্তির সার্থক নিয়োগ ও তার স্বত:স্ফূর্ত বিকাশে সমৃদ্ধিময় ভারত রচনার স্বপ্ন সার্থক হবে।

--- স্বপন ধর

বিকৃতি

প্রথম দৃশ্য

হরেকৃষ্ণ মজুমদার: আসুন আসুন বিবেকবাবু বহুদিন পরে (পান ফেলানোর বাসনা নিয়ে বিবেকবাবুর মুখ ঘুরানো)

হরেকৃষ্ণ মজুমদার: আরে চলে যাচ্ছেন কেন? আসুন আসুন!

হরেকৃষ্ণ মজুমদার: লাইট জ্বালাবেন? সেতো জ্বলছেই।

বিবেক : হু.....হু.....

হরেকৃষ্ণ মজুমদার: আরে মশাই কিছু বলছেন নাকি? বমি করবেন নাকি! (বিবেকবাবু বেত্রাধের সঙ্গে তাকান)

হরেকৃষ্ণ মজুমদার: কী হয়েছে মশাই বলুন না। (হরেকৃষ্ণ মজুমদার বাবু বলতে বলতে মুখের পানের পিক্ হরেকৃষ্ণ মজুমদার বাবুর শার্টে)

হরেকৃষ্ণ মজুমদার: (বেত্রাধের সঙ্গে) আরে আপনি করলেন টা কি! আমার ২০০০ পাউন্ডের শার্ট.....

বিবেক : আ: আ: আমিতো কইতে চাইতাছি পান ফালাইমু, কিন্তু আপনিতো আমারে chance ই দিতেছেন না।

হরেকৃষ্ণ মজুমদার: তাহলে ফেলে আসলেই তো পারতেন, আমার জবাব দিতে যাচ্ছিলেন কেন! যাই সার্ট টা change করে আসি।

বিবেক : আরে শুনেন ই না ২ মিনিটের কথা। ইতার পরে আপনি বদলাইয়েন। আপনি যে কইতাছিলেন, আপনার মেয়ের বিয়ার আলপ, একটা পার্টি পাইছি।

হরেকৃষ্ণ মজুমদার: আরে বলুন বলুন, আগে বলবেন তো! পরিবার কেমন, চেলের কী করে, পন কত চায়।

বিবেক : অততা খবর নিছি না। তবে কইছে আগামি বুধবার আপনার বাড়িতে দেখতে আইব।

হরেকৃষ্ণ মজুমদার: সেকি বুধবার! আমার অফিস, বুধবার হলে কী করে হবে।

বিবেক : ঠিক আছে, আজকে আসি তাহলে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

হরেকৃষ্ণ মজুমদার: এই ফটিক তারাতারি কর, এখনই তারা এসে যেতে পারে। ফটিক আমি একটু আসছি। তুই এদিকটা সামলা।

ফটিক : yes কর্তা, আজকে পুটলি দিদিমনিরে দেখতে পার্টি আইব। কী মজা!

বিবেক : আছেন কেউ বাড়িতে, হরেকৃষ্ণ মজুমদার বাবু.....

ফটিক : আপনে কে?

বিবেক : আমি ঘ.....ঘ.....

ফটিক : ছাড়েন ছড়েন, leave this

বিবেক : তুমি ইংরেজি কও!

ফটিক : Are you match maker?

বিবেক : মানে?

ফটিক : মানে ঘটক কী তুমি?

বিবেক : আজ্ঞে আমি, ঘ.....ঘ.....

ফটিক : ছাড়েন ছাড়েন।

বিবেক : তুমি কে?

ফটিক : আমি হলাম ফটিকচন্দ্র হালদার, হাফপ্যান্টে গুরু, ফুলপ্যন্টে মহাগুরু। আমি এই বাড়িতে কাজ করি।

বিবেক : চাকর!

ফটিক : এই শালা চাকর বলবি না।

ফটিক : তোমার নাম কি?

বিবেক : আমার নাম।

ফটিক : আজ্ঞে

বিবেক : বি.....বি.....বি.....

ফটিক : বি

বিবেক : বি

ফটিক : বি

বিবেক : বি

ফটিক : বিবেকানন্দ?

বিবেক : আরে ধুৎ মশাই।

ফটিক : তাহলে নাম কী?

বিবেক : বি.....বি.....বি.....

ফটিক : বিনয়, বাদল, দীনেশ। (বিবেক ক্রোধের সহিত তাকায়)
ফটিক : আচ্ছা, বলেন বলেন
বিবেক : বি.....বি.....
ফটিক : বিদ্যাসাগর! (বিবেক ক্রোধের সহিত ফটিকের গালে একটি চর মারল)
ফটিক : তাহলে এটা আপনার নাম?
বিবেক : শালা চামড়া ছিড়ে রেখে শুকিয়ে রাখব। আমার নাম বিবেক ঘটক। মারব এখনে লাশ পড়বে শ্মশানে।
ফটিক : এ বাবা এতো কথা বলে গো।
বিবেক : শালা বোবা পাইছস! ডাক তর মালিকরে।
ফটিক : তবে রে..... (মাথায় পাতিল ফাটানো)
বিবেক : শালা নবাবের বচ্ছা (হাতাহাতি)
হরেকৃষ্ণ মজুমদার: এই ফটিক, এই ফটিক, কী করছিস!
ফটিক : দেখেন না বাবু কোথা থেকে একটা মাল জুটেছে, দরজায় এসে ঘেনের ঘেনের করছে।
হরেকৃষ্ণ মজুমদার: (বিবেকবাবুর দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে) আপনি বিবেকবাবু না!
বিবেক : আর কিতা (বিষমভাবে চাকরের অট্টহাসি)
বিবেক : হেই হেই (চাকরের গলায় ধরা)
হরেকৃষ্ণ মজুমদার: আরে ছাড়েন, ছারেন।
এই ফটিক বাজার থেকে সব্জি নিয়ে আয়। আর বিবেকবাবু আপনি বাথরুমে গিয়ে fresh হয়ে আসুন। (চাকরের সাথে বিবেকের চোখ রাঙ্গারাঙ্গি, একসাথে তিনজনের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

পুটলি : (দুহাতে shoping এর ব্যাগ সহ আগমন, ভাঙ্গা পাতিল দেখে দুহাতের ব্যাগ পড়ে যায়) হায় ভগবান আমার হাজার ডলারের সুইডেনের দই। ফটিক, ফটিক, dad, dad (ফটিক তৎক্ষনাৎ আগমন)
ফটিক : Yes madam, what's your problem?
পুটলি : তুই
ফটিক : আমি
পটলি : আমার হাজার ডলারের পাটিল কে ভেঙ্গেছে? (ফটিকের মুখ ঘুরিয়ে প্রস্থান, পুটলি চাকরের হাত ধরে দেখানো) তাহলে তুই, তাহলে তুই।
ফটিক : আগে ছাড়েন, আগে ছাড়েন, তারপর কইতাছি।
পুটলি : (ছাড়িয়া)
ফটিক : Madam ঘরে একটা মাল এসেছে, দেখতে এক্কেবরে বেগুন!
বিবেক : এই এই হ্যাফপ্যান্ট, আমারে বেগুন কস্। ২ টাকার চাকর। (ফটিকের stage ঘোরে পলায়ন)

পুটলি : আপনি কে? (বিবেককে) আমার বাথরুমে কী করছেন? (হরেকৃষ্ণ মজুমদারের আগমন)

হরেকৃষ্ণ মজুমদার: ও আপনি fresh হয়ে এসে গেছেন? এটা হচ্ছে আমার কন্যা। পুটলি ইনি হচ্ছেন বিবেকবাবু। ওনি তোমার জন্য একটা বিয়ের আলাপ দিয়েছেন।

বিবেক : আপনার মেয়ে এতো সুবোধ, এত শান্ত। (পুটলির বিবেকের সহিত ক্রোধের সঙ্গে তাকানো) (ছেলে ও বাবার আগমন)

ছেলের বাবা : হরেকৃষ্ণবাবু ঘরে আইছন নি?

হরেকৃষ্ণ মজুমদার: কে? কে?

নিধু : আমি নিধুরাম সরকার।

হরেকৃষ্ণ মজুমদার: আমি কোথায় বললাম আপনার নাম পেদুরাম সরকার।

বিবেক : ও আপনে আইছেন! হরেকৃষ্ণ মজুমদার বাবু এই হইলা আপনার হবু বেয়াই।

হরেকৃষ্ণ মজুমদার: ও..... আসেন আসেন, আপনার সুপুত্র কোথায়?

নিধু : কই বেটা আয় ওবায় দিয়া। পয়ে ধর, প্রনাম কর। (ছেলের প্রনামের ভঙ্গি)

হরেকৃষ্ণ মজুমদার: এই ফটিক পুটলিকে বল তৈরি হয়ে চা নিয়ে আসতে।

নিধু : আরে ব্যস্ত হইরা কেনে। দুই কথা কই।

হরেকৃষ্ণ মজুমদার: নিধু..... পল্টু..... না ঠিক আছে।

নিধু : আজ্ঞা

হরেকৃষ্ণ মজুমদার: কিছু না, ঠিক আছে।

বিবেক : আইচ্ছা হইছে, হইছে আপনার কন্যারে ডাকুন।

পুটলি : এলাম তো। (পুটলির চা নিয়ে আগমন, পিছনে ফটিক, চা টেবিলে রাখা, হরেকৃষ্ণ মজুমদার বাবুর পিছনে ফটিক)

নিধু : তোমার নাম কী গো?

পুটলি : My name is Sila.

নিধু : উনু তোমার বাবায় ডাকলা পুটলি।

পুটলি : জানেন তো আবার জিজ্ঞেস করছন কেন?

নিধু : মাইগো, মাইগো তোমার যে ঝ্যাঙ!

পুটলি : তা তো আমার আছেন। আপনার চা খাবার কথা চা খান। (নিধু ও পল্টুর, বিবেকের চায়ের চুমুক)

নিধু : দেখিচেইন গো মাই পুটলি না কেটলি, ওবায় দু-চার পায় হাটিয়া দেখাও দেখি। (পুটলির বেত্রাধের সঙ্গে stage জোরে হাটা, ফিরে এসে হরেকৃষ্ণ মজুমদার বাবুকে খোঁচা)

পুটলি : আরে বলেন না (আস্তে)

হরেকৃষ্ণ মজুমদার: দেখিতো বাবা পল্টু না সল্টু তুমিও হেটে দেখাওনা।(পল্টুর ও আবাক দৃষ্টিতে stage জোরে হাটা, বিবেকের ও দৃষ্টি)

বিবেক : আইওছ হইছে, হইছে বোত্তা হইছে। দেনা পাওয়ার কিছু মাত হই যাক।

নিধু : না, না..... আমরা পন উন ইতা নেইনা, আমরা উচ্চ বংশ।

পুটলি : সে কি বাবা? পন ছারা আমি বিয়েই করব না।
ফটিক : একি আপনারা পন নেবেন না?
হরেকৃষ্ণ মজুমদার: না, না..... পন তো আপনার নিতেই হবে। আমার মেয়ে পনের দবি করেছে, পন তো আপনাদের নিতেই হবে।
বিবেক : আইচ্ছা হইছে, হইছে। (হরেকৃষ্ণ মজুমদার বাবুর দিকে) আপনে আপনার মেয়েরে আশীর্বাদ হিসাবে যা দিবা, ইতা আপনার ব্যাপার। (এবার নিধুবাবুর দিকে তাকিয়ে) কিতা ঠিক আছে তো।
নিধু : অয়, অয়..... ই রকম হইলে তো আর কোনো মাতই নাই। তাহলে হরেকৃষ্ণবাবু আজকে উঠি।
হরেকৃষ্ণ মজুমদার: আচ্ছা ঠিক আছে। (সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

(বিয়ের পর নতুন বধু সহ পল্টুর শ্বশুর বাড়িতে আগমন) (হরেকৃষ্ণবাবু বসে পাত্র পাত্রীর অপেক্ষা করছেন) (পাত্র পাত্রীর আগনম)
হরেকৃষ্ণ মজুমদার: এসেছিস মা, এস বাবা পল্টু বস, টান্ডা হও। এই ফটিক তারাতারি চা আর সরবত নিয়ে আয়। (ফটিকের তৎক্ষনাৎ আগমন)
আচ্ছা মা তোমরা থাক, আমি অফিসে যাই। (প্রস্থান হরেকৃষ্ণ মজুমদারবাবুর)
পুটলি : এই পল্টু সেবা তো করলি, কাপ গ্লাস গুলি মাজবে কে?
পল্টু : মা, মা..... মানে।
পুটলি : মা, মা করিস না, তোর মা এখানে না। আর সুটকেস গুলি বা কে ঢুকাবে!
পল্টু : তাহলে ফটিক কি করবে? (ফটিক তৎক্ষনাৎ রামদা নিয়ে আগমন)
ফটিক : এই ফটিক বলিস কি, ফটিক দা বল। (রামদা পল্টুর গলায় ধরে) ব্যাটা ২৫ লাখ টাকা পন নিছস, কী কামে। ইবার কাম কর নয় মর।

পন্চম দৃশ্য

(ফটিক চেয়ারে বসে, ফ্যানেরচ নীচে, সিগারেট টানছে, পল্টু ঘর মুচছে)
পল্টু : ম্যারা জীবন কোরা.....
ফটিক : ম্যানে বালা আভি.....
পল্টু : সালা, ফটিক চরন, এবার তোমার হইব মরন।
(ফটিক বালতি নিয়ে তারা) (তৎক্ষনাত পুটলির আগমন)
পুটলি : কী হয়েছে, এই পল্টু বালতি নিয়ে কোথায় দৌরাচ্ছ।
পল্টু : না পুটলি।
পুটলি : Set up! আমাকে পুটলি বলবেনা। Madam বলবে।
পল্টু : হ্যায়ে হ্যায়ে..... মানে। (পুটলির হাতে বালতি দিয়ে পল্টুর পলায়ন, পুটলির পিছন পিছন ধাওয়া

ষষ্ঠ দৃশ্য

নিধু : কিতারে বাবা ইতা কিতা?

পল্টু : (কেঁদে কেঁদে) বাবা আমি, আমি আমি..... আর ইতার বাড়ি যাইতাম নায়। মারইন আমারে পন দিছে কইয়া, যেতা মনে ধরে ওতা করাইছে। ল্যাট্রিন সাফ করাইছে। আর ইতার বাড়ি য়াইতাম নায়।

নিধু : তাইলে আপনারা কইন আর পন নেওয়া যায় কী? আশীর্বাদ কইয়া উবা ঠগা, আর পন নিতাম না, দিতাম ও না।

--- দেবজ্যোতি আচার্য্য ও ঋতুপর্ণ ভট্টাচার্য্য

Michael Madhusudan Datta

Datta, Michael Madhusudan,
Born January 25, 1824, Sagardari, Bengal -- died June 29, 1873, Calcutta. Poet and dramatist of modern Bengali literature.

Michael Madhusudan Dutt, or simply Madhusudan Datta as he was known before his conversion to Christianity, was the son of a successful Calcutta lawyer. He is important for his contributions to Bengali poetry. Madhusudan experimented ceaselessly with diction and verse forms, and it was he who introduced amitrakshara, a form of blank verse with varied caesuras, and many other original lyric styles. Madhusudan opened a new era in Bengali poetry.

The life of Madhusudan Datta was a turbulent one. He faced poverty, maltreatment and misunderstanding. Although he was a genius of a high order, he was an erratic personality. Madhusudan is a typical example of one of Bengal's intellectual elite caught between tradition and modernity. His early conversion to Christianity is indicative of his cross-cultural condition in life.

Madhusudan's early schooling was in Bengali and Persian. In 1837 he entered Hindu College where most of his education was in English. He remained at Hindu College until age 19 when he converted to Christianity in spite of the

stiffest opposition from family, friends and community. Madhusudan was one of the most brilliant students of his class and perhaps the best English scholar of his college. At first Madhusudan's literary career was directed towards English literature. Later he wrote in Bengali. In 1848 he moved to Madras where he worked as an English teacher. There he published his best and longest poem in English, The Captive Ladie along with other English works. The reception of his English writing was lukewarm.

In 1856 after the death of his father he returned to Calcutta where he began to write Bengali poetry. He remained in Calcutta until 1862 where he married a European woman, Henrietta and moved to Europe to prepare for the Bar. When he returned to Calcutta in 1866 he became a lawyer.

His principal Bengali works, written mostly between 1858 and 1862, include a number of dramas written in prose, long narrative poems, and many lyrics. His most important prose drama, Sarmishtha (1858), is based on an episode in Sanskrit from the Mahabharata. It was well received. His poetical works include the Tilottama-sambhava (1860), a narrative poem on the story of Sunda and Upasunda; the Meghanada-vadha (1861), an epic on the Ramayana theme; Vrajangana (1861), a cycle of lyrics on the Radha-Krishna theme; and Birangana (1862), a set of 21 epistolary poems on the model of Ovid's Heroides. Though he was a Christian and deeply versed in English literature he never severed his link with Bengali. In particular his poetic genius continued to be deeply impressed by the Radha-Krishna stories.

---Saurav Nath